বণিক বার্তা

রেজি নং : ডিএ ৬১০৮ ■ বর্ষ ০১, সংখ্যা ৩০৬ www.bonikbarta.com | সমৃদ্ধির সহযাত্রী

East West University
EAST WEST UNIVERSITY
LIBRARY
Plot No. A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

বণিক বার্তা, ২০২০-০৯-১৩, পৃঃ- ০৪

পর্যালোচনা

আব্দুল বায়েস

মূল্যস্ফীতি ও খানার মঙ্গল প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

অর্থনীতিবিদ মনজুর হোসেন সম্পাদিত 'বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতিক নীতি- প্রবণতা, নিয়ামক ও প্রভাব' বইতে 'মূল্যস্ফীতি ও খানার মঙ্গল' শীর্ষক প্রণিধানযোগ্য এক প্রবন্ধ রয়েছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ে চলমান তর্কবিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণাপ্রসূত পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করছি।

পৃথিবীর সব দেশেই মূল্যস্ফীতির চাপে পড়লে সব শ্রেণীর খানার মাথায় যেন বাজ পড়ে এবং সেটাই স্বাভাবিক। ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের মুখে মাথা খারাপ অবস্থায় কেউ কেউ হয়তো ওই গানটা একটু ঘুরিয়ে গায় আর কি—'জ্বালাইয়া গেলা বাজারে আগুন নিভাইয়া গেলা না'। কিন্তু মূল্যস্ফীতির কারণে সবাই খাদে পড়তে না-ও পারে বরং খোঁড়া পা গর্তে যায় সবার আগে। সম্ভবত সে কথাটাই তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বোঝাতে চাইছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট দুজন গবেষক মনজুর হোসেন ও এম কে মুজেরি।

তাদের প্রবন্ধের সূচনা বক্তব্যে প্রান্তিক সুসংবাদ দিয়ে শুরু। নব্বইয়ের দশকে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকটা জুড়ে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির গড়পড়তা হার ছিল মডারেট স্তরে বা মাঝারি গোছের। অর্থাৎ ওই সময় ৪ শতাংশের নিচে থাকা মূল্যস্ফীতির হার ভোক্তার জন্য স্বর্গীয় আনন্দ এনে নাকডাকা ঘুমের পথ প্রশস্ত করে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে অবশ্য উৎপাদকের উসখুসের অন্ত ছিল না। মূল্যস্ফীতির হার কম থাকলে মন খারাপ করার কথা অর্থনীতিবিদ এ. ডব্লিউ ফিলিপসের। তিনি দেখিয়েছেন যে স্বল্প সময়ে মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্বের মধ্যে স্থিতিশীল এবং বিপরীতমুখী সম্পর্ক আছে অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে বেকারত্ব কমায়। ফিলিপস পরোক্ষভাবে ট্রেড অফ বা পছন্দের কথা বলছেন—পদ্ম ফুল চাও অথচ কাঁটার খোঁচা খাবে না, তা কি কখনো হয়?

আপাতত থাক সেকথা। দেখা গেল, মাত্র কয়েক বছরের মাথায় অর্থাৎ ২০০৭-০৮ সালে সেই নাকডাকা ঘুম ভাঙে বিরাট এক বজ্র পাতে, যখন মূল্যস্ফীতির হার পৌঁছে দুই অংকের ঘরে। মনজুর ও মুজেরি বলছেন, বাংলাদেশ ভীষণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় ২০০৭-০৮ ও ২০১০-১১ সালের তীব্র মূল্যস্ফীতির, বিশেষত খাদ্য মূল্যস্ফীতির তির্যক ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায়। বলা দরকার, ওই দুটো সময়ে মূল্যস্ফীতির বারোমাসি গড়পড়তা হার ছিল যথাক্রমে ১২ দশমিক ২৮ এবং ১০ দশমিক ৮৯ শতাংশ। যাই হোক, ঝড়ের পর যেমন ওলটপালট সবকিছু স্বস্থানে ফিরে আসে, তেমনি মূল্যস্ফীতির হার সাম্প্রতিক ইতিহাসের চূড়া থেকে নেমে ৫-৭ শতাংশে থিতু হয়, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রতি বৈরী নয় বলে বিশ্বাস।

স্বাভাবিকভাবেই সেই সময়কার মূল্যস্ফীতির তির্যক ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা সচেতন মহলে সাড়া জাগায়, বিশেষ করে নীতিনির্ধারক মহলে উদ্বেগ উসকে দেয়, তাদের কপালে ভাঁজ পড়ে। একটা কারণ তো পুরো অর্থনীতির ওপর প্রতিকূল প্রভাব সম্পর্কিত, যেমন মূল্যস্তর ঊর্ধ্বমুখী হলে অর্থের চাহিদা বাড়ে, ফলে সুদের হার ওপরে উঠে বিনিয়োগ কমায় এবং সামগ্রিক ব্যয় হ্রাস পেয়ে জিডিপি সংকুচিত হয়। অন্যটি হচ্ছে মূল্যস্ফীতি বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষত দরিদ্রের প্রকৃত আয় হ্রাস করে খানার সার্বিক কল্যাণ কমিয়ে দেয়। তাছাড়া দামের আপেক্ষিক পরিবর্তনসাপেক্ষে সম্পদ সন্নিবেশে বিকৃতি ও অসমতার প্রসঙ্গ উপেক্ষা করার মতো নয়।

মূল্যস্ফীতির একটা জাদুকরী শক্তি হচ্ছে, এটা কমবেশি সবাইকে কাঁদায়। চিলির নোবেলজয়ী কবি কাম কূটনীতিক কাম রাজনীতিবিদ পাবলো নেরুদা বলতেন, হে পেঁয়াজ তুমি কাঁদাও আঘাত না করেই। মূল্যস্ফীতি অবশ্য প্রকৃত আয় নামিয়ে আঘাত করে অশ্রু ঝরায়। কিন্তু কার অশ্রু ঝরে মূল্যস্ফীতির ঝড়ে—সেটি এক মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন। আপাতদৃষ্টে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে দরিদ্রের ওপর মূল্যস্ফীতির মঙ্গল-প্রভাব নিতান্তই নেতিবাচক। অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি ঊর্ধ্বমুখিতা গরিবকে আরো গরিব করে। তা হলেও নীতিনির্ধারক মহল জানতে চায়, কোন ধরনের খানা মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখিতার কারণে অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এবং আংশিক হলেও তাদের দুর্ভোগ নিরসনে কী পদক্ষেপ নেয়া যায়।

লেখকদ্বয় মূল্যস্ফীতির প্রভাব নির্ণয়ে দুটি বিশেষ গোষ্ঠী যথা দিনমজুর ও স্থির আয়সম্পন্ন খানা বেছে নিয়েছেন। তারপর এদের মধ্যে চারটি শ্রেণীর ওপর—গরিব, নিম্নমধ্যম আয়, উচ্চমধ্যম আয় এবং উচ্চ প্রভাব জানার জন্য আলাদা আলাদা ভোক্তা সূচক তৈরি করেন। ২০০৮-১১ সমকালে তারা জানতে চেয়েছেন, প্রথমত মূল্যস্ফীতি বিভিন্ন শ্রেণীর ওপর কীভাবে এবং কী রকম প্রভাব রাখে এবং দ্বিতীয়ত, ক্ষতিগ্রস্তরা মজুরি সমন্বয় করে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সক্ষম কিনা। বিদ্যমান প্রায়োগিক পর্যবেক্ষণ টেনে তারা বলতে চান যে এমনিতে মজুরি মূল্যস্ফীতির পেছনে পড়ে থাকে; মূল্যস্ফীতি যখন ঊর্ধ্বমুখী হয় তখন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে মজুরি বৃদ্ধিকে টপকে গিয়ে ভোক্তার টুঁটি চেপে ধরে। তার মানে মূল্যস্ফীতি আয়বিন্যাসে পরিবর্তন আনে, তবে তা মজুরি থেকে মুনাফায়। বস্তুত এর ওপর ভিত্তি করেই অভিযোগ আনা হয় যে মূল্যস্ফীতি আয়বৈষম্য ঘটায় যখন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে ধনীর চেয়ে দরিদ্রের ওপর আঘাত হানে বেশি। তবে অনেক গবেষণা, আমেরিকার পরিপ্রেক্ষিতে এমন কথাও বলছেন যে মূল্যস্ফীতি নিম্ন আয়ের লোকদের বা শ্রমিকশ্রেণীর দিকে আয় পুনর্বণ্টন করে।

মূল্যস্ফীতির সাম্প্রতিক প্রবণতা ও উৎস বলছে, সার্বিক মূল্যস্ফীতিতে খাদ্য মূল্যস্ফীতির প্রভাব প্রবল। বিশেষত মোটা ও মাঝারি মানের চালের দাম মূল্যস্ফীতিকে উসকে দেয়। বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতিতে আন্তর্জাতিক বাজারের চাল ও অন্যান্য পণ্যের দামের গতিপ্রকৃতিও অবদান রাখে। এলাকাভিত্তিক বিশেষত শহর ও গ্রামের মূল্যস্ফীতির হারের তারতম্যের পেছনে চালের বাজারের অবস্থা দায়ী। ২০১০-১১ অব্দি একটা লম্বা সময় খাদ্য মূল্যস্ফীতি খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতির চেয়ে বেশি ছিল এবং তারপর নিচেরটা উপরে ওঠে, ওপরেরটা পড়ে নিচে।

গবেষকদের পর্যবেক্ষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে অন্য কিছুর সঙ্গে ওই সময়ের মূল্যস্ফীতির আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল খাদ্যের দাম। দরিদ্রসহ বিভিন্ন শ্রেণীর খানা অন্তত খাদ্যের দামের ব্যাপারে বেশ স্পর্শকাতর। আর তাই স্বল্প ও মধ্যম সময়ের তাগিদ হচ্ছে যথাযথ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে খাদ্যে খানাগুলোর প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করত মঙ্গল সাধন করা। তবে 'ওয়ান সাইজ ফিটস অল' পদ্ধতিতে এগুলো চলবে না

সমীক্ষার সময়কালে দিনমজুর ও স্থির আয়ের খানার ওপর খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতির চেয়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতির অভিঘাত ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি; ঠিক তেমনটি শহরের খানায়, গ্রামের খানার তুলনায়। খাদ্য মূল্যস্ফীতির বেলায় গ্রামের দিনমজুর কম খাদ্য মূল্যস্ফীতির মুখোমুখি ছিল স্থির আয়ের দরিদ্রশ্রেণীর তুলনায়। তার মানে, দিনমজুরশ্রেণী মজুরি সমন্বয় করে প্রকৃত মজুরি ধস ঠেকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে সক্ষম হয়। সাধারণত শহর বা গ্রাম উভয় জায়গায় অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের খানার ওপর মূল্যস্ফীতির চাপ অপেক্ষাকৃত বেশি। এমনিভাবে গ্রামের স্থির আয়ের এবং শহরের দিনমজুর নানান ভোগাস্তির মাধ্যমে অন্যদের চেয়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতির মূল্য বেশি দেয়।

২০০৮-১০ নাগাদ খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি পিছিয়ে ছিল কিন্তু ২০১০-১১ সালে খাদ্য মূল্যস্ফীতিকে টপকে যায়। খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতির প্রভাব শহরের কিংবা গ্রামের খানায় প্রায় একই রকম, তবে গ্রামের দরিদ্র অন্যদের তুলনায় একটু বেশি ভোগে। বলা বাহুল্য, অন্যদের তুলনায় এবং খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতিতে শহরের 'বাবু' কাবু হয় বেশি।

মোদ্দাকথা, গবেষকদের পর্যবেক্ষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে অন্য কিছুর সঙ্গে ওই সময়ের মূল্যস্ফীতির আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল খাদ্যের দাম। দরিদ্রসহ বিভিন্ন শ্রেণীর খানা অন্তত খাদ্যের দামের ব্যাপারে বেশ স্পর্শকাতর। আর তাই স্বল্প ও মধ্যম সময়ের তাগিদ হচ্ছে যথাযথ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে খাদ্যে খানাগুলোর প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করত মঙ্গল সাধন করা। তবে 'ওয়ান সাইজ ফিটস অল' পদ্ধতিতে এগুলো চলবে না, কারণ যাদের কথা বলা হচ্ছে, তারা সমজাতীয় যেমন নয়, তেমনি নয় তাদের আয় কিংবা সম্পদ সঞ্চয়ন। সুতরাং গড়পড়তা নীতি যে আসল লক্ষ্যে পানি ঢেলে দেবে, তা বলা বাহুল্য। যেমন সবাই গরিব কিন্তু কারো অন্তত কিছু সম্পদ আছে, কারো হয়তো কিছুই নেই; সবাই গরিব কিন্তু নারী খানা প্রধানের ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত বেশি, ভূমিহীনদের জন্য সরাসরি হস্তান্তর ছাড়াও মজুরি বৃদ্ধি পায় এমন গণ কর্মসূচি হাতে নেয়া, কৃষিপণ্য উৎপাদককে ন্যায্যমূল্য দেয়া, চালবহির্ভূত পণ্যের জন্য সাপ্লাই চেইন শক্তিশালী করা, কৃষিঋণ, উপকরণ যথাসময়ে এবং যথাদামে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, কৃষকের কাছে বাজারের তথ্য তুলে ধরা ইত্যাদি।

আব্দুল বায়েস : অর্থনীতিবিদ; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির খণ্ডকালীন শিক্ষক